সমাজে শিক্ষকদের স্থান কোথায়?

॥ এ. এন, রাশেদা ॥

মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমার আব্বা কি করেন'? সে উত্তর দিয়েছিল 'মাষ্টারী করেন'। আমি কেন যেন পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি মাষ্টার হবে'? নিমেষে ছেলেটির মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল, তড়িঘড়ি করে উত্তর দিল, 'না-না, আমি মাষ্টার হব না'। কিন্তু মাষ্টার না হওয়ার সাথে চেহারার এই পরিবর্তন কেন? তাহলে কলেজের এই চত্বর পেরিয়ে ও যখন আরও বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, তখন কি এই একইভাবে চিন্তা করবে সে? আমার হাত থেকে কলম পড়ে গেল, মাথা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল, আমার এতদিনের সমস্ত মনোবল, অদম্য স্পৃহা ও উৎসাহ মুহূর্তেই যেন সব নিঃশেষ হয়ে যেতে চাইল। নানা প্রশ্ন এসে মনের মাঝে ভিড় করল। আমার অবয়বের প্রতিচ্ছবি দেখার সুযোগ অবশ্য ছিল না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বসে নিজেকেই নিজে আবার পরখ করলাম—খুবই কি অন্যায় প্রশ্ন করেছি? আমার অবস্থা দেখে আমার সহকর্মী আমাকে বাঁচালেন। 'মাষ্টার হতে দোষ কি? আমরাও তো মাষ্টার।' ছাত্রটি নির্বিকার চিত্তে বলল, 'আপনারাতো স্যার প্রফেসার।' তিনি বললেন 'প্রফেসার ও তো মাষ্টার'। সে বলল 'আপনারা স্যার কলেজের।' বুঝলাম স্কুলের শিক্ষকতায় ওর আপত্তি। বললাম, 'স্কুল না পেরোলে তুমি কলেজে আসতে কি করে?' ও আর উত্তর করল না। এত কিছু ভাবার অবকাশ ওর কোথায়? ও হয়ত শুধু জানে স্কুল শিক্ষক বাবার সংসারের টানাপোড়েনের কথা, মা'র অতৃপ্ত আত্মার কথা, বিয়েতে ভাল দান দিতে না পারার বোনের চোখের জলের কথা, কিংবা বিবাহযোগ্যা বোনের বিয়ে না হওয়ার কথা। তাই বাবার আদর্শকে ভালবাসার, উচ্চে তুলে ধরার মানসিকতা তো তার থাকতে পারে না। ওর প্রয়োজন টাকার, বেঁচে থাকার। মা'কে তার বন্ধুদের মা'য়ের মত ধনীর পোশাকে দেখার, বোনের বিয়েতে অনেক লাল-নীল আলো দেখার। মাষ্টারী করে তো এসব হবার নয়। বাবাকে সে এমন দেখেনি।

আজ শিক্ষকতা পেশা এমনই এক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। যাদের স্কুল কলেজ যাওয়ার বয়সী সন্তান আছে তারাই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরীর কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আজ অবধি কোন মহাবিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায়নি। স্বয়ংক্রিয় মস্তিষ্ক অর্থাৎ কম্পিউটার এমনিতেই কাজ করে না, তার পরিচালনার জন্য চিন্তা ও কাজ করে মনুষ্য মস্তিষ্কই। কাজেই যত মহান কিছু আবিষ্কারের যত যন্ত্রই আবিষ্কৃত হোক না কেন অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরীর যন্ত্র আবিষ্কার হবার নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষক তৈরী হতে পারে একমাত্র তাঁর ক্রমাগত অভিজ্ঞতা ও সার্বক্ষণিক জ্ঞানার্জনের দ্বারা—তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রের যে কোন অঙ্গনেই বিচরণ করুন না কেন। শিক্ষক সর্বক্ষণ যে জ্ঞান অর্জন করেন তা তো বিতরণের জন্যই। কাজেই শিক্ষক তাঁর পেশায় শয়নে-স্বপনে, চিন্তা-চেতনায় সর্বক্ষণই নিয়োজিত। কাজেই শিক্ষকের থাকতে হবে সে সময়। থাকতে হবে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন ও আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস আমাদের দেশে শিক্ষক সমাজের মাঝে একেবারেই নেই। কাজেই দিনভর করতে হচ্ছে তাঁদের কঠিন পরিশ্রম। শিক্ষকতার উৎকর্ষ বৃদ্ধির অবকাশ না পেয়ে তাঁরা কেউ কেউ করছেন টিউশনি। সারাক্ষণই করছেন চর্বিত চর্বন। কেউ ছুটছেন ব্যবসার দিকে। নূতন নূতন উদ্ভাবনীর সাথে, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাথে অথবা নিজেকে গবেষণার মাঝে ডুবিয়ে রাখার অবকাশ তাঁর কোথায়? বিশ্বব্যাপী নিত্য নূতন তথ্য জানার জন্য যে আর্থিক সংগতি তাও তো তাঁর নেই।

আমার পরিচিত অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেন যাঁরা বাধ্য হয়েই এ পেশা পরিত্যাগ করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন আছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রকৌশল কলেজের শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তেমনি স্কুল শিক্ষকও। এ পেশায় আর পোষায় না। বিয়ের উপযুক্ত বোন ঘরে, ছোট ভাইদের লেখাপড়া, বৃদ্ধ মা-বাবা, নিজের সন্তান, স্ত্রী এ তো প্রায় সংসারেরই চেহারা। কাজেই শিক্ষকতার ঐ অসম্মানজনক সম্মানী নামক ভিক্ষে দিয়ে শিক্ষক সমাজ তো বাতাস খেয়ে চলতে পারে না। তাই অনন্যোপায় শিক্ষক সমাজের অনেককে সজ্ঞানেই করতে হচ্ছে কিছু নৈতিকতা বিরোধী কাজ। নাম করা স্কুলে চলে ভর্তিকালীন ভর্তির জন্য কোচিং কিম্বা ক্লাসে পড়ানোর চাইতে প্রাইভেট পড়ানোর যৌক্তিকতার চিন্তা। অফিস-আদালতে উপরি পাওনাকে হালাল করা হয়েছে 'আমাদের হক' বলে। এ পাওনা যেমন চলে পথের মোড়ে মোড়ে তেমনি চলে ফাইলপত্রের নৃত্যের তালে তালে। যারা তাল কেটে দেন তারাই পড়েন বিপদে। কিন্তু সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই যদি কমবেশী অর্থনৈতিক কষ্ট হোত তাহলে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু গুটিকতকের হাতে সম্পদ দিয়ে শিক্ষক সমাজকে অবহেলা জাতির জন্য কল্যাণকর হয় না। শিক্ষকতার মানে যদি হয় না খেয়ে থাকা, অমর্যাদাকর পেশা হিসেবে বিবেচিত হওয়া, তাহলে এই পেশায় মেধাবী ছাত্ররা আসতে পারে না। আর এ পেশায় মেধাবীরা না এলে তা যেকোন ক্ষেত্রেরই হোক, এর উন্নয়ন ঘটবে না। 'অমেধাবীরা' আসবে, এমন ভাবারই বা কি কারণ আছে? যারা ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়া ভালবাসে না তারা শিক্ষকতা করবে কোন ভালবাসায়? তাই অপারগ হয়েই যদি আসে তাহলে শিক্ষাদান কেমন হবে তাও সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এর পরেও ব্যতিক্রম কিছু থাকে। যেমন ভাল ছাত্র হলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না, আবার সাধারণ মেধার ছাত্ররাও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও একাগ্র সাধনার ফলে শিক্ষকতায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেন। যদিও এ অন্য প্রসঙ্গ। তাই সমাজের মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করার জন্য অবশ্যই তাদের উচ্চতর সম্মানী দিতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। একজন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত পি-এইচডি ডিগ্রিধারী অথবা সমমানের শিক্ষিত ব্যক্তি যদি মনে করেন তিনি শিশুদের শিক্ষা দেবেন, শিশুদের গড়ে উঠতে সাহায্য করবেন, শিশুদের স্কুলে নিজেকে নিবেদিত করবেন, তাহলে কেন তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্মানজনক সম্মানী পাবেন না? শিশুদের সামনে এই বিশাল জ্ঞানরাজীকে কত সহজভাবে তুলে ধরা যায়, শিশুমনের হাজারো প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়, সেজন্যও তো দরকার বিস্তৃত জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি ডাঃ মারিয়া মন্টেসরীর কথা। যাঁর শিক্ষা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল: শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, খেলাধূলা ও ভালবাসার ভিতর দিয়ে খেলনার সাহায্যে শিশুদের মন, বুদ্ধি ও শরীরের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা। সে শিক্ষা পদ্ধতি আজ সারা বিশ্বেই স্বীকৃত। ডাক্তার মারিয়া মন্টেসরী অসহায় ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা করতে যেয়ে বুঝতে পেরেছিলেন সে সময়কার শিশুদের প্রতি অবজ্ঞার কথা, শিক্ষাব্যবস্থার কড়াকড়ির কথা, যা তাদের কচি মন দলিত-মথিত করত। তাই তিনি শিশুদের নূতন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। আরও পড়াশুনার জন্য আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে দর্শনশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে একইসাথে পড়াশুনা করেছিলেন। তারপর যোগ দিয়েছিলেন রোমের বস্তি এলাকায় টলমো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক স্কুলে এবং তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে পাঁচ বছরের কম সময়ের মধ্যেই তিনি আশাপ্রদ ফললাভ করেছিলেন। আমরা আরও স্মরণ করতে পারি লেখক ও শিক্ষাগুরু আন্তন মাকারেঙ্কোর কথা। যার শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল শিক্ষাদানের নিত্য-নূতন প্রণালী ও পদ্ধতির সন্ধান। এই সব উন্নত ও নূতন ধরনের পদ্ধতির উদ্ভাবন তখনই সম্ভব যদি সেখানে যুক্ত হয় মেধা, শিক্ষা ও একাগ্রতা। আর এসবেরই সমন্বয় ঘটবে যদি থাকে সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্মানী ও মর্যাদা, অবস্থান তা যেখানেই হোক।

এই অবস্থা কি একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? তা তো নয়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও পাঠক্রমে কোনো ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মহানুভবতার বাণী শোনান হয়েছে বলে মনে হয় না। কি করে এসব অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল, কাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা বৃটিশ শাসনামলে, এদেশের কুসংস্কারপূর্ণ শিক্ষার পাশ দিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, কোন কোন স্কুল প্রতিষ্ঠার পিছনে কোন শিক্ষক বা দরদীদের ত্যাগের ভাস্বর মহিমা প্রজ্বোলিত হয়ে আছে—এ সব ইতিহাস সিলেবাসের মধ্যে অবান্তর মাত্র। যে জাতি তার জাতীয় বিকাশের ত্যাগী-আত্মবলিদানকারী মহাপুরুষদের ইতিহাসকে স্মরণ করে না, জাতির সামনে তুলে ধরে না, তাদের সন্তানদের সে সব কাহিনী জানাতে গৌরববোধ করে না, সে জাতির সন্তানদের কাছে শিক্ষকতার প্রতি এহেন উন্নাসিকতা ছাড়া আর কি আশা করা যাবে? তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও যে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে এবং তার আদর্শের পক্ষে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সে স্তম্ভ কোথায়? কেননা, সে ভিত্তি তো দেয়া হয়নি। ফ্লোরেন্স নাইটএঙ্গেলের জীবনী পড়ে যেমন হাজারো কিশোরী সেবা ধর্মে ব্রতী হয়ে এগিয়ে আসে তেমনি এ উপমহাদেশে যে লক্ষ মহান শিক্ষকের জন্ম হয়েছিল তাদের ইতিহাস তো জাতির সামনে নেই। কোথায় তাদের উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রচেষ্টা? দেশবাসী তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানে?

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ৮২'র হিসাব মতে দেখা যায় সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক আছেন ১৭৫৮৭১ জন, মাধ্যমিক শিক্ষক ৮৯৬৬৯ জন, বেসরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১০৩৩৪ জন, প্রকৌশল ২২৬ জন, মেডিক্যাল ৬৭৯ এবং কৃষি ৩৫৮। এছাড়াও পলিটেকনিক, মাদ্রাসা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসহ আরও অনেক আছেন। আর তাঁদের উপর ন্যস্ত রয়েছে দেশের ১,৩৭,০৩,১৬২ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ। যাঁরা অন্যের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? সবার ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে চাকুরী জীবন শেষে এতটুকু আশ্রয়ের আশ্বাস তো কোথাও